গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২৪ জানুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

২৭ জানুয়ারির বন্‌ধের সমর্থনে বিপুল সাড়া

গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এক নতুন আক্রমণ হানা হচ্ছে

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রভাস ঘোষ

"২৭ জানুয়ারি বন্‌ধ হবে সর্বাত্মক। বিশেষ করে গ্রাম শহরের গরিব মানুষ এই বন্‌ধকে অন্তর থেকে সমর্থন করছেন। জেলাগুলি এবং কলকাতা শহর থেকে যে রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি তা থেকে পরিষ্কার যে, জনসাধারণ এস ইউ সি আই দলের উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন" — ১৭ জানুয়ারি দলের রাজ্য দপ্তরে আহূত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, শিক্ষা ক্ষেত্রে মাশুল, চার্জ, ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। শাসক দলের মদতে সমাজবিরোধী, পুলিশ আমাদের কর্মীদের উপর নির্যাতন করেছে, লাঠি গুলি চালিয়েছে। এগুলো আগেই হয়েছে। এবার যেটা বিশেষভাবে করা হচ্ছে তাহল আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা পরিকল্পিত প্রচার বলা হচ্ছে। আন্দোলন মানে 'অরাজকতা', 'অশান্তি', বন্‌ধ কর্মনাশা, বন্‌ধ মানে একটা ছুটির দিন ইত্যাদি। এভাবে আন্দোলনের রাজনীতিকে খাটো করার চেষ্টা হচ্ছে। মালিকশ্রেণী কায়েমী স্বার্থবাদীরা চাইছে একটাই রাজনীতি থাক, তাহল ভোটের রাজনীতি। প্রতিবাদ, আন্দোলনকে ওরা মুছে দিতে চাইছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত রাজ্য কমিটির বক্তব্যে বলা হয়েছে —

২৭ জানুয়ারি এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২৪-ঘন্টার বাংলা বন্‌ধের কর্মসূচিকে সর্বস্তরের জনগণ গভীর আবেগের সাথে নিজেদের বাঁচার লড়াইয়ের কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শুধু মধ্যবিত্তরাই নন, শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণী, গ্রামাঞ্চলের গরিব কৃষক ও খেতমজুরেরা এবং শহরের দিনমজুরেরা ব্যাপকভাবে এই বন্‌ধের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষ অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বন্‌ধের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ১০ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ ডাকিয়ে এস ইউ সি আই পরিচালিত লাগাতার আন্দোলন ও ২৭

তিনের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎগ্রাহকদের আইন অমান্য

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, অবিলম্বে বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে ২০ জানুয়ারি রানি রাসমণি রোডে গ্রাহকরা আইনঅমান্য করে কারাবরণ করছেন।

ইরাকে মার্কিন যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশে দেশে উত্তাল বিক্ষোভ

১৮ জানুয়ারি ঃ (বাঁদিকে) মস্কোয় স্ট্যালিনের ছবি হাতে যুদ্ধবিরোধী মানুষের মিছিল (ডাইনে) হায়দ্রাবাদে বাম দলগুলির ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ

সারা ভারত ডি এস ও'র ষষ্ঠ সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অঙ্গীকারে ভাস্বর, হাতে রক্তপতাকা, সংখ্যায় তিরিশ হাজারেরও বেশি — ওরা এসেছে দেশের ১১টি প্রদেশ থেকে। ৯ জানুয়ারি ২০০৩-র অপরাহ্নে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বাঙ্গালোর শহরের ন্যাশানাল কলেজ প্রাঙ্গণ অভিমুখে। সারা ভারত ডি এস ও'র ষষ্ঠ সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে আসা এই অগ্রণী ছাত্রদের মিছিল ছিল বিশাল কিন্তু সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ। ব্যাপক কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত, বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুসংগঠিত, রক্তপতাকার আন্দোলনে বর্ণময়, সুসজ্জিত — আবেগমথিত কণ্ঠে শিক্ষায় ব্যবসায়ীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ সঞ্চারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত স্লোগানে মুখর। রাজ্যের বুকে সর্বকালের বৃহৎ এই ছাত্র সমাবেশে যোগ দিতে আসা ছাত্র সৈনিকদের এই অভিযান বাঙ্গালোরবাসী সাধারণ মানুষের কাছে এনে দেয় এক নতুন অনুপ্রেরণা।

এই বিশাল মিছিল ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু ভাষাভাষী সাধারণ ভারতবাসীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। যারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যে ও পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের অভিন্ন লক্ষ্যে একসূত্রে বাঁধা। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তিটি সম্বন্ধে সচেতন, ছাত্র সমাজের এই সর্বাধিক অগ্রগামী অংশটি সারা ভারত ডি এস ও'র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার অবলুপ্তি সাধনে শাসকশ্রেণীর সমস্ত অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বেলা চারটেয় সুসজ্জিত বিশাল মিছিল ন্যাশানাল কলেজ প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছায়। শুরু হয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন।

প্রথমে শিক্ষাসংক্রান্ত কোটেশন একজিবিশনের উদ্বোধন করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সম্মেলন অভ্যর্থনা কমিটির উপদেষ্টা শ্রী এইচ এস ডোরাইস্বামী। চিত্রপ্রদর্শনীর সূচনা করেন গুলবর্গার শরণা বাসবেশ্বরা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রী জি এস মেলাকুণ্ডি। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত ডি এস ও'র সভাপতি কমরেড প্রতাপ শামল।

অধিবেশনের শুরুতে শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন সারা ভারত ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী, সহ-সভাপতি কমরেড সান্টু গুপ্ত এবং অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনের উদ্বোধন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — "যদি শিক্ষা ব্যবস্থা ভুলপথে পরিচালিত হয়, তবে আমাদের দেশ হবে এক তৃতীয় শ্রেণীর দেশ এবং দেশের মানুষও হবে তৃতীয় শ্রেণীর। বর্তমানে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সামনে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ এক গভীর বিপদ ডেকে এনেছে। কংগ্রেস সরকার প্রবর্তিত নয়া শিক্ষানীতি '৮৬ থেকে এর গোড়াপত্তন। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাবার নামে নয়া শিক্ষানীতি '৮৬ ভোকেশনাল এডুকেশনের আবির্ভাব ঘটায় যা একটা মস্ত প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা লক্ষণীয় যে, সারা ভারত ডি এস ও'র নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষা আন্দোলন শাসকশ্রেণীর এই শিক্ষাবিরোধী কার্যক্রমকে কিছুক্ষেত্রে রুখতে পেরেছে।" তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার মহান সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে আহূত এই ছাত্র সম্মেলনের সর্বিক সাফল্য কামনা করেন।

অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার বলেন, মানুষ কর্তৃকই সমস্ত ধর্মের বুনিয়াদ রচিত হয়েছিল এবং সব ধর্মই নারীকে অবদমিত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করে। সুতরাং নীচু ক্লাসে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করলে তা যুবসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চায় বাধা সৃষ্টি করবে।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে বিশাল ছাত্রসমাবেশের একাংশ।

শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সংগ্রামের অন্যতম অঙ্গ এই ছাত্র সম্মেলনকে সফল করতে উদ্যোক্তাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত কর্ণাটকবাসী এবং বিশেষ করে বাঙ্গালোরের সাধারণ মানুষকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী।

এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ইতিহাস উদ্ধৃত করে বলেন যুগে যুগে শাসক শোষক শ্রেণী তাঁদের শ্রেণীস্বার্থকে বজায় রাখতে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে এবং সাধারণ মানুষ মুক্তির হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার আলোকে গ্রহণ করেছে। আজও এই দুই শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্ব বর্তমান। শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের মাধ্যমে সরকার সাধারণ মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ চাইছে প্রকৃত জনমুখী শিক্ষা-ব্যবস্থা। এই অবস্থায় সারা ভারত ডি এস ও আকাঙ্ক্ষিত ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে উঠে এসেছে। আমাদের একান্ত প্রত্যয় যে এই সম্মেলন আগামী দিনে আরও উন্নত আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করবে। এস ইউ সি আই কর্ণাটক রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে তিনি আগত প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিদের অভিনন্দন জানান।

প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার বলেন — "বিভিন্ন ভাষা এবং ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর ঐক্যকে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাই নিশ্চিত করতে পারে। এইখানেই আঘাত করা হচ্ছে। একটা জাতির সংহতি গড়ে তোলারে জন্য জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় সকল ভাষা-বর্ণ-ধর্মাবলম্বী মানুষেরই সে অবদান ছিল এই সত্যের স্বীকৃতি দরকার, সকলের মূল্যবোধের মধ্যে যেখানে ঐক্য রয়েছে, তাকে উপলব্ধি করা দরকার। হিন্দু ইতিহাস, মুসলিম ইতিহাস এই ভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা করাটা ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ছাড়া কিছু নয়। একইভাবে হিন্দু মূল্যবোধ, মুসলিম মুল্যবোধ বলাটাও ভুল। আমাদের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে রাজনীতিকে ইসলামীকরণ করে দেশকে সর্বাত্মক ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এটা সত্যই মর্মান্তিক যে শিক্ষার ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটিয়ে ভারতবর্ষের শাসক রাজনীতিবিদরা পাকিস্তানী শাসকদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।"

অন্যতম অতিথি বক্তা বিশিষ্ট গুজরাটি পত্রিকা 'জনসত্তা'র প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীপ্রকাশভাই শাহ তাঁর ভাষণে গুজরাটের সাম্প্রতিক গণহত্যার জন্য বিজেপি সরকারের তীব্র নিন্দা করেন। মানবকল্যাণ মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশীর শিক্ষাকে গৈরিকীকরণের তত্ত্বকে বিদ্রূপ করে তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বলেন, 'শিক্ষা কথার অর্থ অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় 'জ্ঞানার্জন' বোঝালেও গুজরাটিতে তার আরেকটা অর্থ হয় — উচিত শাস্তি দেওয়া। এন ডি এ নেতৃত্বকে দুটো শিক্ষাই দেওয়া উচিত — উপযুক্ত বোধ এবং শাস্তি। সংঘপরিবার যাই ঘোষণা করুক না কেন, গুজরাট এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং আগামী প্রথম সুযোগেই গুজরাটবাসী তাদের রাজ্যের অগৈরিকীকরণ ঘটাবে।

সারা নেপাল ন্যাশনাল ফ্রি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের (সংযুক্ত) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রকাশ পোখরেল শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেপালের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেপালী ছাত্র সমাজের সংগ্রামের ইতিহাস ব্যক্ত করেন। নেপালের বিপ্লবী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে তিনি ভারতের সংগ্রামরত ছাত্রদের প্রতি সংহতির অঙ্গীকার করেন।

বাংলাদেশ থেকে আগত পাঁচজন প্রতিনিধি দলের নেতা কমরেড খোকন দাস বলেন, ভারতের ছাত্ররা যেমন এদেশে শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক তেমনই বাংলাদেশের ছাত্ররা সেদেশের বুকে তীব্র মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলছে। সারা ভারত ডি এস ও'র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগ্রামী আন্দোলন তাদের প্রেরণার উৎস।

প্রধান বক্তার ভাষণে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, আজ জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ গত শতাব্দীর বিশ এবং ত্রিশ দশকের থেকেও অনেক তীব্র এবং দীর্ঘায়িত অতি-উৎপাদন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ, বিশেষ করে আমাদের দেশের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এবং তাদের সরকারগুলো সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণকে পদদলিত করছে, পরিকল্পিতভাবে সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টার্জিত অধিকারগুলোকে কেড়ে নিচ্ছে, সর্বত্র ফ্যাসিবাদী ঝোঁক দ্রুত দানা বাঁধছে। ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাকেও মুছে ফেলার জন্য এক জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। সবচেয়ে বেশি আক্রমণ নেমে আসছে মানবিক চিন্তা বিশেষ করে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাপদ্ধতি এবং কোমল সংবেদনশীল সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর। এরকম একটা তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে যখন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রচণ্ডভাবে উদ্বিগ্ন, ঠিক তখনই সারা ভারত ডি এস ও'র নেতা-কর্মীরা ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, কেবলমাত্র

সাতের পাতায় দেখুন

গরিবের বাঁচার পথ খোলার জন্যই এই বন্‌ধ

রাজ্যের ধানচাষিরা গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন, কারণ রেকর্ড ফসল, বাজারে দাম পড়ে যাচ্ছে। আলু চাষির মাথায় হাত, তাঁরা রেকর্ড উৎপাদন করেছেন, ফসল ফলিয়ে তাঁরা বিপদে পড়েছেন। ফসলের ন্যায্য দরটুকু পেতে তাঁদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। দোকানে থরে থরে টিভি, ফ্রিজ সাজানো, খদ্দের নেই। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি। একদিন বন্‌ধ করলে বন্‌ধবিরোধীরা 'গেল' 'গেল' রব তোলেন — বলেন বন্‌ধ হলে উৎপাদন মার খাবে, বন্‌ধ 'আত্মঘাতী'। অথচ সবচেয়ে বেশি বন্‌ধ করে মালিকশ্রেণী। কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ কমায়, সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ চালু করে, দিনের পর দিন লক-আউট করে, ক্লোজার করে। যারা বলে 'বন্‌ধ কর্মনাশা', কলকারখানায় কাজ চালু রাখার জন্য তাদের সোচ্চার হতে দেখা যায় না। রাজ্যের শিল্পনগরী দুর্গাপুর শ্মশানপ্রায়, বহু চা-বাগান বন্ধ, হাওড়া সহ শহরতলির হাজার হাজার ক্ষুদ্র শিল্পে তালা ঝুলছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মই নেই যে নাশ হবে। চার্জ আকাশচুম্বী, তাই গরিবের কাছে হাসপাতালের দরজা বন্ধ, স্কুল-কলেজের ফি লাফ দিয়ে বাড়ছে গরিবের সামনে শিক্ষার দরজা বন্ধ, বিদ্যুতের দাম যেভাবে বাড়ানো হচ্ছে তাতে আলো জ্বালাও বন্ধ, চাষি ফসলের দাম পাচ্ছে না তার খেটে খাওয়ার রাস্তা বন্ধ, বেকার যুবকের সামনে সুস্থভাবে বাঁচার পথ বন্ধ। রাজ্যের সবকিছুই তো প্রায় বন্ধ হয়েই আছে। বন্‌ধ 'কর্মনাশা' নয়, কর্মনাশা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবরা স্টেশনে বন্‌ধের সমর্থনে প্রচার

বন্‌ধ-এর দাবি বন্ধ করার নয়, খোলার। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, কলকারখানার দরজা খুলতে হবে গরিবের কাছে। ফি, চার্জ, শুল্ক, সেস কমাতে হবে, চাষি মজুরের সামনে খেটে খাওয়ার পথ খুলে দিতে হবে। সরকার নামক লুঠেরার লুঠ বন্ধ করতে হবে। বন্‌ধ কর্মনাশা নয় — কর্ম সৃষ্টির দাবি।

যারা ধনী, তাদের সামনে সব সুযোগই খোলা, যারা সুবিধাভোগী তারা নিজেদের সুবিধার স্বার্থে স্থিতাবস্থার পূজারী। তারা বন্‌ধ-এর বিরুদ্ধে যেতে পারে। একচেটিয়া সংবাদপত্রের প্রাণভোমরা হল মালিকশ্রেণী ও সরকারের বিজ্ঞাপন। সংবাদপত্র মালিকদের নৈতিক বুদ্ধি মালিকশ্রেণীর সুরে বাঁধা। বন্‌ধের দিন তারা গরিবের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে। আর, সারা বছর পেপসি-কোক-ফ্যাসান প্যারেডের প্রচার করে।

আমাদের একটা দেশের মধ্যেই রয়েছে দুটো দেশ। একটা হল ধনীদের সব পেয়েছির দেশ, সেখানে খানাপিনা, আমোদপ্রমোদ, কিছুরই অভাব নেই, অভাব নীতিবোধের, অভাব গভীর চিন্তার, অভাব দেশপ্রেমের। আর একটা দেশ গরিবের — সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নেই; বাঁচার পথ নেই। আছে মর্যাদাবোধ, দেশের প্রতি ভালবাসা, প্রতিবাদী মন। দেশের রাজনীতি জগতেও রয়েছে দুটো রাজনীতি; মালিকের রাজনীতি, মজুরের রাজনীতি ; ধনীর রাজনীতি, গরিবের রাজনীতি ; ভ্রষ্টাচার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নীতিহীন ভোটের রাজনীতি, আদর্শে উদ্বুদ্ধ লড়াকু বিপ্লবী রাজনীতি। ধনীর দলেরাও বন্‌ধ ডাকে, কংগ্রেস বিজেপি ডাকে ভোটের স্বার্থে, সি পি এম বন্‌ধ ডাকে গদির স্বার্থে, ভেতরে ভেতরে

মালিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া। তাদের সংগ্রামহীন বন্‌ধ ছুটির চেহারা নেয়, বন্‌ধ-এর ধার তারা কমিয়ে দেয়। গরিবের পার্টির বন্‌ধ-এর জাত আলাদা, এ-বন্‌ধ লড়াইকে জোরদার করে, জনগণকে লড়তে শেখায়; মালিকশ্রেণী ও সুবিধাবাদীদের বুকে কাঁপন ধরায়। তাদের প্রসাদভোগী একচেটিয়া প্রচার মাধ্যম ওই একদিন 'গরিবের' দুঃখে বড় কাঁদে! বলে ওদের মজুরি মারা গেল। সারা বছর তারা গরিবের খবর রাখে না। কদিন আগে খালপাড়ে যাদের ঘর বুলডোজারে ভাঙা হয়েছে, আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়েছে, প্রবল

চারের পাতায় দেখুন

নতুন আক্রমণ

ওরা চায় শুধু গদির রাজনীতি থাক, আন্দোলনের রাজনীতি মুছে যাক

একের পাতার পর

জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধের কর্মসূচিতে ব্যাঘাত সৃষ্টির যে চেষ্টা হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সি পি এম ১০ জানুয়ারির বন্‌ধের মুখে বিরুদ্ধতা করলেও তলে তলে প্রচার করেছে, '২৭ জানুয়ারি নয়, ১০ জানুয়ারি বন্‌ধ করুন'। জনগণ এটা প্রত্যাখান করেছেন। কারণ জনগণ জানেন, এস ইউ সি আই একমাত্র দল যে এরাজ্যে জনজীবনের নানা জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে লাগাতার গণআন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাইমারিতে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি অর্জন করেছে। তাই সর্বস্তরের জনগণ এস ইউ সি আই সংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে গভীর আস্থা পোষণ করেন। সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস ও ফ্রন্টের অন্যান্য দলের নিচু তলার সৎ কর্মী ও সমর্থকরাও ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধকে সমর্থন করছেন।

এতদিন সরকার আন্দোলন ভাঙবার জন্য লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস চালাত, আমাদের দলের কর্মীরা মার খেয়ে, রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে লড়াই করত। সম্প্রতি আরেকটা আক্রমণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে — আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য প্রচার করা হচ্ছে, আন্দোলন হচ্ছে 'বিশৃঙ্খলা', 'অরাজকতা', 'অশান্তি', বন্‌ধ হচ্ছে 'কর্মনাশা', 'ছুটি কাটানো' ইত্যাদি। এটা একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। অবিভক্ত বাংলার সংগ্রামী যৌবন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগ থেকেই

বন্‌ধের সমর্থনে সাইকেল মিছিল। ১৫ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে।

শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন-লড়াই-সাধারণ ধর্মঘট-হরতাল করেছে, সমগ্র দেশকে অনুপ্রাণিত করেছে। বর্তমানে পুঁজিবাদী শোষণবিরোধী সংগ্রামের স্তরে এস ইউ সি আই দল এই গণআন্দোলনের ঝান্ডা বহন করে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সকল প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে। কারণ বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, শিক্ষা, শিল্পক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই দুই সরকার জনগণের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে ও তা আরও তীব্র করছে। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, কোথায় কিভাবে আরও ট্যাক্স ও মূল্যবৃদ্ধি চাপানো যায়। বলতে গেলে সূর্যের আলো ও নিঃশ্বাসের বায়ু ছাড়া প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ট্যাক্স চাপানো হয়েছে। সদ্যোজাত শিশুর আঁতুড় ঘর থেকে মৃতের শ্মশানঘাট পর্যন্ত সর্বত্র প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর মূল্য ধার্য হয়েছে ও বাড়ানো হচ্ছে। ফলে সমস্ত গণআন্দোলন বন্ধ করার জন্য দুই সরকারই মরিয়া।

সি পি এম সহ সকল সরকারি দলই চেষ্টা করছে, যাতে এরাজ্যে একমাত্র ভোটে গদি দখলের রাজনীতিই থাকে, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের রাজনীতি না থাকে। পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন, তাই এখন কোটি কোটি টাকা ঢেলে ব্রিগেড প্যারেড ভরানোর কম্পিটিশন চলছে, চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জ চলছে।

আমরা আশা করি, ২৭ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক বাংলা বন্‌ধকে সফল করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ একদিকে দাবিগুলি আদায়ের সংগ্রাম তীব্রতর করবেন এবং অন্যদিকে গণআন্দোলন বিরোধী ও ভোটসর্বস্ব এই সুবিধাবাদী রাজনীতিরও উপযুক্ত জবাব দেবেন।

বন্‌ধে ছাড়

বন্‌ধের আওতা থেকে হাসপাতাল, বিদ্যুৎ-জল-দুগ্ধ সরবরাহ, সংবাদমাধ্যম, ফায়ার ব্রিগেড, শবদাহ, বিবাহ অনুষ্ঠানের কর্মসূচি, বি ই কলেজের একটি সেমিনারের কর্মসূচি বাদ থাকবে।

বন্‌ধের পরও আন্দোলন চলবে

তিনের পাতার পর

শীতে খোলা আকাশের নীচে সেই বাস্তুহারা পরিবারের শিশুবৃদ্ধ বৃদ্ধারা কেমন আছে — কটা খবরের কাগজ তার খবর রাখে? বেকার যুবক, ছাঁটাই শ্রমিক, গরিব চাষির নিরুপায় জীবনের ব্যথাবেদনা, তাদের বাঁচার দাবি সংবাদপত্রে ঠাঁই পায় খুব কম। সংবাদপত্রে তারা খবর হয় আত্মঘাতী হলে, বিষ খেলে বা গলায় দড়ি দিলে। যে গণমাধ্যমের

বেশিরভাগেরই এই চরিত্র, বন্‌ধ তাদের চোখে অরাজকতা, অশান্তি, কর্মনাশা, ছুটির দিন হবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তারা চায় প্রতিবাদ বন্ধ হোক, আন্দোলন বন্ধ হোক। অভাবী মানুষ বেঁচেও মরে থাকুক; জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন কাটিয়ে শেষে মরে বাঁচুক। কিন্তু ধনীর যেন শান্তিভঙ্গ না হয়। সরকারের কুম্ভকর্ণের ঘুমে যেন ব্যাঘাত না ঘটে।

কিন্তু চাইলেই সব হয় না। যুগে যুগে শোষকরা চেয়েছে শোষিতের লড়াই বন্ধ করতে, পারেনি। রাজতন্ত্র চেয়েছে প্রজাবিদ্রোহ বন্ধ করতে, বলেছে, রাজার বিরুদ্ধাচরণ মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাওয়া। ফল, অনন্ত নরকবাস। বেঁচে থাকা যাদের কাছে নরকযন্ত্রণা সেই শোষিত মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে লড়াইকে আঁকড়ে ধরেছে। রাজতন্ত্র খতম হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছে পরাধীন ভারতবাসী ঘুমিয়ে থাক, ব্রিটিশের শোষণ চিরস্থায়ী হোক। ক্ষুদিরাম ভগৎ সিং মাস্টারদারা বলেছেন — কোটি কোটি ভারতবাসীর শান্তি যারা কেড়েছে তাদের শান্তির বাণীতে ভুলো না, জাগো, লড়ো। আজ ভারতের শোষক বুর্জোয়ারা গরিব মধ্যবিত্তের জীবনের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে বলছে বন্ধ করো না, শান্তি ভঙ্গ করো না। বুর্জোয়া দলগুলি, যারা বিরোধী পক্ষে থাকলে গদির সঙ্কীর্ণ স্বার্থে কখনো কখনো বন্‌ধও ডাকে, তারা বলছে বন্‌ধ শেষ অস্ত্র। বলছে, আন্দোলন করো তবে কানুনী চৌহদ্দির বাইরে যেও না। শোষণের খুঁটিতে বেঁধে গলার দড়িতে যতটা ঢিল দেওয়া আছে তার মধ্যে চরে খাও, তারপর নিঃশব্দে মরো। চিৎকার করে শান্তিভঙ্গ করো না।

কিন্তু এই শোষণমূলক ব্যবস্থা যাদের সামনে মরা ছাড়া আর সব পথ বন্ধ করেছে, সেই লক্ষ কোটি গরিব মানুষ তা মানবে কেন? এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, এরাই তো দেশ, এরাই তো ভারতবর্ষ, এরাই ২৭ জানুয়ারি বন্‌ধ-এর মূল শক্তি। গরিবের সামনে বাঁচার পথ খোলার দাবিতে এই বন্‌ধের ডাক দিয়েছে গরিবের দল এস ইউ সি আই। এ-বন্‌ধ আন্দোলনকে আরও তীব্র করার পথে একটি ধাপ। বন্‌ধের পর আন্দোলন হবে নতুন তেজে বিল বয়কট, গণআইনঅমান্য, প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ, জনগণের মতামত নিয়ে লাগাতার ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধ — এমনভাবে চলবে লড়াই। অতীতে এদেশের বড় বড় বামপন্থী আন্দোলনে মানুষ লড়েছে, নেতৃত্ব পেছিয়েছে। গণসংগ্রামকে ব্যালট বাক্সে কবর দিয়েছে। এবারের নেতৃত্ব ভিন্ন জাতের, তারা পিছোবে না। এগোতে হবে মানুষকে। যতদিন দাবি আদায় না হয়।

দীর্ঘ আন্দোলনের পর গত ১৬ নভেম্বর এস ইউ সি আই ঘোষণা করেছিল জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে এই বন্‌ধ হবে। তারপর জনগণের মতামত নিয়ে ২৭ জানুয়ারি বন্‌ধের তারিখ ঘোষণা করেছিল গত ১৭ ডিসেম্বর। এই বন্‌ধকে ভাঙতেই ডাকা হয়েছিল ১০ জানুয়ারির বন্‌ধ। তাকে সমর্থন জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস। এমনকি সি পি এমও পরোক্ষে বন্‌ধ সফল করতেই সাহায্য করেছে। রাস্তা থেকে বাস তুলে নিয়েছে, দূরপাল্লার বাসের সময়সূচি পরিবর্তন করেছে, ঘোষণা করেছে 'ক্যাডাররা পথে নামবে না।' কিন্তু যাদের জন্য বন্‌ধ সেই জনগণই এই চালাকি ধরতে পেরেছেন, তাই তারা এতে সাড়া দেননি। সর্বত্রই জনগণ বলছেন, 'আমাদের বন্‌ধ ২৭শে।' জনগণের এই সংগ্রামী মেজাজ ধরতে পেরে তারা এখন নতুন কৌশল নিয়েছে, প্রচার করছে 'আবার একটা বন্‌ধ কেন?' এইভাবে সংগঠিত আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে, জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং বন্‌ধকে ব্যর্থ করতে তারা নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করছে।

তাই জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বরকম আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ২৭শে'র বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল করতে হবে। বামপন্থার পীঠস্থান পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রমাণ করবেন সংগ্রামের ময়দানে তাঁরা পিছপা নন। জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদ জিন্দাবাদ।

মেদিনীপুরে সি পি এমের নৃশংস হামলা

গরিব মধ্যবিত্ত মানুষ যখন সরকারি লুণ্ঠন নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২৭ জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধকে সফল করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন আতঙ্কিত সি পি এম হামলা চালাল এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকদের উপর গত ১৬ জানুয়ারি মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থানার ডাংগরপাড়া গ্রামে।

৪৫ বছর যাবৎ খাসজমির পাট্টাপ্রাপ্ত এস ইউ সি আই কর্মী দরিদ্র নিরঞ্জন দাসের দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সি পি এমের লোকজন ঐ জমিটি দখল করতে গেলে স্থানীয় মানুষের বাধায় পিছু হটে যায়, পরে বহু সংখ্যক দুষ্কৃতীকে নিয়ে সি পি এম পুনরায় সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে বহু বাড়ি ভাঙচুর করে, আগুন লাগিয়ে দেয়, সোনার গহনা সহ সমস্ত সম্পদ লুঠ করে। এই আক্রমণে মাথায় টাঙ্গির কোপে মৃতপ্রায় কমরেড নিরঞ্জন দাসকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয় এবং শ্যামাপদ মণ্ডল, ইন্দ্র মণ্ডল, গৌরী মণ্ডল, সীতা দাস, সরস্বতী মণ্ডল, সাবিত্রী পড়্যাকে আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯ জানুয়ারি নিরঞ্জন দাসের মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, চিকিৎসকদের মতে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

১৭ জানুয়ারি সহস্রাধিক মানুষের নারায়ণগড় থানা ঘেরাও এবং পথ অবরোধের ফলে থানার ও-সি এই নৃশংস ঘটনার নেতা সি পি এমের পঞ্চায়েত সদস্য ললিত দাস, পঞ্চায়েত প্রধান বাসুদেব মল্লিক, তপন চক্রবর্তীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ সরিয়ে নেওয়া হয়।

পরদিন এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এলাকা পরিদর্শন করে এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, গরিব মানুষের বাঁচার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ই এই ধরনের ষড়যন্ত্র, একে ব্যর্থ করতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

মৃতপ্রায় নিরঞ্জন দাসের শোকার্ত স্ত্রী বন্দনা দাস। (নিচে) নারায়নগড় থানায় বিক্ষোভ।

স্বর্ণকার সংঘের বর্ধমান জেলা সম্মেলন

অখিল ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘ'র জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮ ও ৯ জানুয়ারি বর্ধমান শহরে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানান হয়। উক্ত সম্মেলনে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত বিশ্বাস। তিনি বলেন, স্বর্ণকারদের নিজস্ব সমস্যাগুলিকে বৃহত্তর জনসাধারণের সমস্যা থেকে পৃথক করে দেখলে চলবে না। সমস্ত সমস্যাগুলিই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই সংগঠনের পক্ষ থেকে যেমন স্বর্ণকারদের সমস্যাগুলি নিয়ে লড়তে হবে, তেমনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জনজীবনের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও অংশ নিতে হবে। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বর্ণকারদের নিজস্ব দাবি, যেমন হলমার্ক রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা, বৃত্তি করের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা প্রভৃতির পাশাপাশি প্রস্তাব গৃহীত হয়, গৃহস্থ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মূল্য এক করা এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা চলবে না। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে সম্মেলনে আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইরাকে মার্কিন হস্তক্ষেপ কখন ও কিভাবে শুরু হয়েছিল

(এই প্রবন্ধটির লেখক রিচার্ড বেকার। ইনি আমেরিকায় অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকশান সেন্টার-এর পশ্চিমাঞ্চল বিভাগের সহ পরিচালক। ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার সৌজন্যে লেখাটি পাওয়া গিয়েছে। ১৯৫৮ সালে ইরাকে রাজতন্ত্রের শাসন উচ্ছেদকে লেখক 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন।)

ইরাকের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপের শুরু কেন হয়েছিল, কেমনভাবে তা ঘটেছিল? এই সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু কর্পোরেট প্রচার মাধ্যম — যারা ইরাক সম্পর্কে বুশ প্রশাসনের মিথ্যা ও শঠতার জোরালো প্রচার দিচ্ছে — তারা দেয়না। অবশ্য এর যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

আট দশক আগে শুরু হওয়া এই মার্কিন নীতির একটাই লক্ষ্য ঃ ইরাকের সম্পদ কব্জা করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ইরাকে মার্কিন অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছিল। ঐ যুদ্ধ হয়েছিল দুই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের মধ্যে। এই যুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মান, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান ও অটোমান (তুর্কি) সাম্রাজ্য। অপরদিকে ছিল ব্রিটিশ-ফরাসি-রুশ সাম্রাজ্যবাদী আঁতাত। তখন মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশই অটোমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের এজেন্ট টি ই লরেন্স — যিনি 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া' নামে হলিউড ছবির দর্শকদের কাছে পরিচিত — তার মাধ্যমে আরব নেতাদের নিশ্চয়তা দেয় যে, আরব নেতারা যদি ব্রিটিশের পক্ষ নিয়ে তুর্কি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ে, তাহলে যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শাসকরা স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠন সমর্থন করবে। ঐ সময়ই ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীরা গোপন সাইকস-পিকট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে ভাগ-দখল করা হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বলশেভিক পার্টিই প্রথম এই চুক্তির সংবাদ প্রকাশ করে দেয়, এবং এই সাম্রাজ্যবাদী চুক্তিকে ধিক্কার জানায়।

আরব ও কুর্দিশ জনগণ যখন 'গণতন্ত্র' দেওয়ার নামে সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রতারণা ধরে ফেলল তখন সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। যতদিন ঔপনিবেশিক শাসন ছিল এ বিদ্রোহ ততদিন চলেছে। অত্যাচার হয়েছে চরম। ১৯২৫ সালে ইরাকের কুর্দিশ শহর সুলাইমানিয়াতে ব্রিটিশরা বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। যুদ্ধবিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানোর ওটাই ছিল প্রথম ঘটনা।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। লেবানন ও সিরিয়া ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে যায়, প্যালেস্টাইন, জর্ডন এবং ইরাকের দক্ষিণের দুটি প্রদেশ বাগদাদ ও বাসরা বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

বর্তমান ইরাকের উত্তরাংশ মোসুল প্রদেশকে নেবে, তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সাইকস-পিকট চুক্তি অনুযায়ী এটা ছিল ফ্রান্সের 'প্রভাবিত এলাকা'র অধীন। কিন্তু কুর্দিশ জনবহুল মোসুল প্রদেশকে ব্রিটিশরা তাদের নতুন ইরাক কলোনিতে যুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। নিজের দাবি জোরদার করতে ১৯১৮ সালে তুর্কি শাসকদের আত্মসমর্পণের চারদিনের মধ্যে বৃটিশ সৈন্য মোসুল অধিকার করে নেয় এবং তা কখনো ছাড়েনি। মোসুল দখল নিয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ মেটানোর পথ ধরেই ইরাকে মার্কিন ভূমিকার সূচনা ঘটেছিল। মোসুলের বিশাল তেলসম্পদের জন্যই মোসুলের উপর বৃহৎশক্তিদের এত নজর।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়, তখন তার মিত্র ও শত্রু উভয়পক্ষই যুদ্ধে ক্লান্ত। ঐ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নানা শর্তের মধ্যে অন্যতম ছিল এটাই যে, যুদ্ধের পর মার্কিন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থপূরণ নিশ্চিত করতে হবে, যার মূল কথা ছিল নতুন কাঁচামালের উৎসে, বিশেষত তেল সম্পদের উপর মার্কিন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কলোনিয়াল অফিসার স্যার আর্থার হার্টজেল, তার সহযোগীদের সতর্ক করে বলেন, "মনে রাখবে, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি ইরাকের দখল নিতে মরিয়া।" (পিটার স্লাগহলেটের 'ব্রিটেন ইন ইরাক, ১৯১৪-৩২', ১৯৭৪ বই থেকে উদ্ধৃত)

১৩ জানুয়ারি ঃ স্কটল্যান্ডের লচ লঙে অস্ত্রঘাঁটির সামনে বিক্ষোভ

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আধিপত্যাধীন অঞ্চলে প্রবেশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে দাবি করে 'খোলা দরজা' নীতি, অর্থাৎ মার্কিন তেল কোম্পানীগুলিকে ইরাকের ব্রিটিশ তাঁবেদার রাজা ফয়জলের সঙ্গে অবাধে ব্যবসায়িক চুক্তি করার অধিকার দিতে হবে। ফয়জলকে ইরাকের সিংহাসনে ব্রিটিশরাই বসিয়েছিল।

ইরাক নিয়ে যুদ্ধবিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিরোধের অবসান ঘটে ইরাকের তৈল সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারার মধ্য দিয়ে। বৃটিশরা ইরাকে তাদের নতুন কলোনির অংশরূপে মোসুলের দখল রেখে দেয়। ইরাকের তৈল সম্পদ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকে ২৩.৭৫ শতাংশ করে ভাগ পায়। বাকি পাঁচ শতাংশ পায় বৃহৎ তেল ব্যবসায়ী ক্যালোস্টে হালবেনকিয়ান, যিনি 'পাঁচ ভাগ অংশীদার' নামে পরিচিত। ইনিই তেল ভাগাভাগির চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন। বাস্তবে ইরাকের ভাগে থাকল ইরাকের তেলের শূন্য শতাংশ। ইরাকের এই অবস্থা ছিল ১৯৫৮ সালের বিপ্লবের আগে পর্যন্ত।

১৯২৭ সালে ব্যাপক তেলসন্ধান শুরু হয়। মোসুল প্রদেশে বিপুল তেল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। দু'বছর বাদে এ্যাংলো ইরানিয়ান কোম্পানি, (এখন ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) শেল, মোবিল এবং স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অফ্ নিউ জার্সি (এক্সন) ইত্যাদিকে যুক্ত করে ইরাকি পেট্রোলিয়াম কোম্পানি গঠন করা হয় এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ইরাকের তেল উৎপাদনে এদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়ে যায়। এইসময়ে ওয়াশিংটনের মদতে আল সৌদ পরিবার নিকটবর্তী আরব দ্বীপপুঞ্জগুলির বেশিরভাগ দখল নিয়ে নেয়। ১৯৩০ সালে সৌদি আরব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়। সৌদি রাজধানী রিয়াদে আরব আমেরিকান অয়েল কোম্পানির (ARAMCU) ভবনে মার্কিন দূতাবাস স্থাপিত হয়। এতেও মার্কিন তেল কোম্পানিগুলি ও তাদের ওয়াশিংটন সরকার সন্তুষ্ট হয়নি। পশ্চিম গোলার্ধের তেল সম্পদের উপর যেমন তারা প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল তেমনই মধ্যপ্রাচ্যেও তারা চেয়েছে তৈল সম্পদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। এর অর্থ ছিল, মধ্যপ্রাচ্যের তেলের উপর তখন ব্রিটেনের যে কর্তৃত্ব ছিল, তাকে হটিয়ে সেই স্থানটি দখল করা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকাকে সেই সুযোগ এনে দিল। যুদ্ধে সাধারণ অর্থে আমেরিকা ও ব্রিটেন ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল ঠিকই। কিন্তু একইসাথে তলে তলে তারা ছিল পরস্পরের ঘোর শত্রু। এই যুদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই বাইরে এশিয়ায় প্রধান প্রধান উপনিবেশগুলিও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ১৯৩৯-৪২-এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল; বোঝা যাচ্ছিল, ব্রিটেন আর কখনই তার আগেকার আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। অন্যদিকে যুদ্ধের সমগ্র পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত শক্তিধর হয়ে উঠেছে। ওয়াশিংটন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, ঠিক কোন্ সময়ে যুদ্ধে যোগ দিলে তাদের সুবিধা হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান প্রশাসন — যার মধ্যে ব্যাঙ্কিং, তেল ও অন্যান্য কর্পোরেট স্বার্থের জোরদার প্রভাব ছিল — তৎপর চেষ্টা চালাচ্ছিল যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে যেখানে মার্কিন আধিপত্য নিশ্চিত করা যাবে।

এই লক্ষ্যে পরিচালিত মার্কিন রণনীতির তিনটি মূল উপাদান ছিল — ১) আণবিক ও সাধারণ উভয় যুদ্ধাস্ত্রের ক্ষেত্রেই মার্কিন সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করা, ২) ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ককে ব্যবহার করে মার্কিন আধিপত্যাধীন কর্পোরেট পুঁজির বিশ্বায়ন ঘটানো এবং ডলারকে বিশ্বের প্রধান বিনিময় মুদ্রা রূপে প্রতিষ্ঠা করা, ৩) বিশ্বের সম্পদের উপর, বিশেষত তেলের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা।

যুদ্ধের ময়দানে যখন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলছে, তখন পর্দার আড়ালে অপর একটা সংঘর্ষ আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে শুরু হয়েছিল — বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব এতই তীব্র ছিল যে, ১৯৪৪ সালের ৪ মার্চ (নরম্যানডিতে 'ডি-ডে' আক্রমণ করার তিন মাস আগে) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে একটি বার্তা পাঠান, যার মধ্যে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী বাসনা ও প্রবল শত্রুতামূলক মনোভাব অস্বাভাবিক চড়া সুরেই ধ্বনিত হয়েছিল ঃ "ইরাক ও ইরানে আমাদের তেল ক্ষেত্রগুলির উপর কেউ মেষদৃষ্টি (ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি) ফেলছে না, আপনার এই আশ্বাসের জন্য অনেক ধন্যবাদ। প্রতিদানে আমি সম্পূর্ণ ভরসা দিচ্ছি যে, সৌদি আরবে আপনার স্বার্থে ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও চিন্তা আমাদের নেই। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো এ ব্যাপারেও আমার পরিষ্কার

ছয়ের পাতায় দেখুন

শয়তান শিরোমণি কে ?

ইরান, ইরাক, উত্তর কোরিয়া, লিবিয়া — মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের ভাষায় এরা হলো axis of evil — 'শয়তানের জোট'। কারণ এরা নাকি প্রতিরক্ষায় প্রচুর খরচা করছে। অথচ দেশ-বিদেশের প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডি প্রভৃতি সূত্র থেকে আহরিত তথ্যের ভিত্তিতে সেন্টার ফর ডিফেন্স (CDI) নামক সংস্থার পরিবেশনে শয়তান চিহ্নিতকরণের চিত্রটা বিপরীত। মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট ১৯ লক্ষ ৮০০ কোটি টাকা, আর উক্ত চারটি দেশের প্রতিরক্ষায় মিলিত বরাদ্দের পরিমাণ ৬২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকাও নয়। আমেরিকার হাতে মজুত গণবিধ্বংসী পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ ১১ হাজার থেকে ১৩ হাজার যা জাপান ও ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্মিলিত মজুতের দ্বিগুণ। গণবিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্রের মজুতে আমেরিকা দ্বিতীয়। অর্থনৈতিক সামরিকীকরণের ধাক্কায় আমেরিকার ৫০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ প্রতিরক্ষায়। অন্যদিকে সেদেশের প্রতিটি রাজ্যে বাজেটে বিস্তর ঘাটতি — নিউইয়র্কে ২১ বিলিয়ন, ক্যালিফোর্ণিয়ায় ২১ বিলিয়ন। অন্যদিকে ঘাটতি মেটাতে জনসাধারণের ওপর চলছে সম্পদ কর এবং অন্যান্য ট্যাক্স।

তাহলে শয়তান শিরোমণি খেতাব পাবার যোগ্য কে?

(সংবাদসূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০২)

ইরাকে মার্কিন হস্তক্ষেপ

পাঁচের পাতার পর

অবস্থান হচ্ছে, যুদ্ধের ফলাফল থেকে এলাকাগত বা অন্য কোনরকম সুযোগ সুবিধা গ্রেট ব্রিটেন নিতে চায় না; অন্যদিকে যেসব জিনিস ব্রিটেনের দখলে রয়েছে সেগুলি থেকেও যেন ব্রিটেনকে বঞ্চিত করা না হয়। মহৎ উদ্দেশ্যসাধনে নিজের সর্বোত্তম প্রয়াস নিয়োজিত করার পর ব্রিটেন এই আশা করতেই পারে, বিশেষত যতক্ষণ আপনার অত্যন্ত অনুগত সেবক ব্রিটেনের শাসন পরিচালনা করছে।" (কোলকো, 'দি পলিটিকস্ অফ ওয়ার' নিউ ইয়র্ক, ১৯৬০, বই থেকে উদ্ধৃত)

চার্চিলের এই চিঠি পরিষ্কার দেখিয়েছিল যে, ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি নয়া উপনিবেশ ইরাক ও ইরানের দখল নেওয়ার জন্য মার্কিন শাসকরা এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে, তা ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

চার্চিলের তর্জন গর্জন ছাড়া ব্রিটেনের অন্য কিছুই ছিল না, যা দিয়ে তারা আমেরিকার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে আটকাতে পারে। কয়েক বছরের মধ্যেই ব্রিটেন এই নতুন বাস্তবের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়, নিজেকে আমেরিকার জুনিয়ার পার্টনার হিসাবেও মেনে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বিস্তৃত হয়

১৯৫৩ সালে সি আই এ ক্যুপ করে শাহকে ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। ১৯৫০ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের যৌথ নিয়ন্ত্রণে ছিল।

১৯৫৫ সালে ওয়াশিংটন বাগদাদ চুক্তি করে, যার মধ্যে মার্কিন তাঁবেদার পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, ইরাক ও ব্রিটেনের শাসকরা ছিল। বাগদাদ চুক্তি অথবা সেন্টো (সেণ্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন)-এর দুটি লক্ষ্য ছিল ঃ

প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার আরব ও অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্থানে বাধা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক শিবির তথা সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, উত্তর কোরিয়া এবং উত্তর ভিয়েতনামকে ঘিরে রাখা ন্যাটো, সিয়াটো ও আনজাস-এর সাথে আর একটি সামরিক জোটকে যোগ করা। 'সেনটো'র মূল কেন্দ্র ইরাক ছিল নামে স্বাধীন। ব্রিটিশরা ইরাকে তাদের সামরিক বিমান ক্ষেত্রগুলি বহাল রেখেছিল। যদিও দেশটি তেলসমৃদ্ধ, বিশ্বের ১০ শতাংশ তেলভাণ্ডার রয়েছে ইরাকে, তথাপি দেশের জনগণ চূড়ান্ত দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় দিন কাটাত। ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ নিরক্ষর। ৬০০০ মানুষ পিছু একজন ডাক্তার, পাঁচ লক্ষ মানুষ পিছু একজন দাঁতের ডাক্তার ছিল।

ইরাক শাসন করত রাজা দ্বিতীয় ফয়জল-এর অধীনে এক দুর্নীতিবাজ রাজতন্ত্র এবং সামন্তী ভূস্বামী ও বণিকি পুঁজিপতিদের একটি চক্র।

ইরাকের জনগণের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে একটি সহজ সত্য ঘটনা। তাহল, নিজস্ব বিপুল তেলভাণ্ডারের উপর ইরাকেরই কোনও অধিকার নেই।

১৯৫৮

কিন্তু ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই এক তীব্র সামাজিক বিস্ফোরণে ইরাক কেঁপে ওঠে। এক সামরিক বিদ্রোহ দেশজুড়ে বিপ্লবে পরিণত হয়। রাজা ও তার প্রশাসনের হঠাৎ কোনও খোঁজই পাওয়া যায় না। এই ঘটনায় ওয়াশিংটন ও ওয়াল স্ট্রীট স্তম্ভিত হয়। পরবর্তী এক সপ্তাহ ধরে মার্কিন সংবাদপত্র 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এর প্রথম দশ পাতায় ইরাকি বিপ্লব ছাড়া আর কোন সংবাদ ছিল না বললেই চলে।

এই বিপ্লবের ছমাস পরে ঘটে যাওয়া কিউবার মহান বিপ্লবের কথা যদিও আজ বেশি স্মরণ করা হয়, কিন্তু সেই সময় ইরাকের অভ্যুত্থান ছিল আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে অনেক বেশি বিপজ্জনক।

প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এই সঙ্কটকে বলেছিলেন, 'কোরিয়ার যুদ্ধের পর গভীরতম সঙ্কট।' ইরাকি অভ্যুত্থানের পরদিন ২০,০০০ মার্কিন নৌসেনা লেবাননে নামে। তারপরের দিন ৬৬০০ ব্রিটিশ সৈন্য প্যারাসুটে জর্ডনে অবতরণ করে।

ইরাকে এই সরাসরি মার্কিন সেনা অভিযানই পরবর্তীকালে "আইসেন হাওয়ার মতবাদ" রূপে পরিচিত হয়। যার মূল কথা ছিল মধ্যপ্রাচ্যে বিপ্লবের বিস্তার আটকাতে আমেরিকা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করবে, যুদ্ধেও যাবে।

মার্কিন ও ব্রিটিশ তৎপর বাহিনী লেবানন ও জর্ডনের নয়া উপনিবেশবাদী সরকারগুলিকে রক্ষা করতে তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেনারা না গেলে ইরাক বিপ্লব থেকে উদ্ভূত জনগণের আবেগ বেইরুট ও আম্মানের নিকৃষ্ট তাঁবেদার শাসকদেরও নিশ্চিত উচ্ছেদ করে ছাড়ত। কিন্তু আইসেনহাওয়ার, তাঁর সেনাপতিবর্গ ও হাড়েমজ্জায় সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফসটার ডালেসের মনে অন্য অভিসন্ধিও ছিল; তাহচ্ছে ইরাকে আক্রমণ চালানো, বিপ্লবকে ধ্বংস করা এবং বাগদাদে একটি নতুন পুতুল সরকার কায়েম করা। কিন্তু তিনটি সমস্যা ওয়াশিংটনকে ১৯৫৮ সালে ঐ পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য করে। ১) ইরাক বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী চরিত্র, ২) ইরাকের সীমান্ত রাষ্ট্র ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক ঘোষণা করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাক দখলের চেষ্টা করলে, তাদের সৈন্যবাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়বে, ৩। ইরাক বিপ্লবের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরালো সমর্থন দিয়েছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণাংশে ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেনা সমাবেশ শুরু করেছিল। এইসব ঘটনা সামগ্রিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক বিপ্লব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন কখনই ইরাক হাতছাড়া হওয়ার ঘটনাকে হজম করতে পারেনি।

পরবর্তী তিন দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশলে স্বাধীন রাষ্ট্র ইরাককে দুর্বল ও খাটো করার চেষ্টা করেছে। ১৯৭২ সালে ইরাক যখন ইরাকি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে জাতীয়করণ করার কাজ সম্পূর্ণ করেছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের দক্ষিণপন্থী কুর্দিশ বিদ্রোহীদের ব্যাপক সামরিক সাহায্য দেয় বাগদাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এবং আমেরিকার তৈরি করা সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকায় ইরাককে যুক্ত করে। বিপ্লব পরবর্তী ইরাকের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমেরিকা কমিউনিস্ট ও বামজাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কট্টর দক্ষিণপন্থীদের মদত দিতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৭০-এ বাথ পার্টির সাদ্দাম হোসেন সরকার কর্তৃক ইরাকি কমিউনিস্ট পার্টি ও বাম ট্রেডইউনিয়নগুলির উপর দমনপীড়নকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূয়সী প্রশংসা করেছিল।

১৯৮০-তে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মদত দিয়েছিল, অস্ত্র ও অর্থসাহায্য করেছিল। ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইরানে মার্কিন আধিপত্যের অবসান ঘটেছিল। বাস্তবে ইরাক-ইরান যুদ্ধে আমেরিকার লক্ষ্য ছিল দুটি দেশকেই দুর্বল করা, ধ্বংস করা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঙ্গার ঐ যুদ্ধে আমেরিকার আসল মতলব ফাঁস করে বলেছিলেন "আমার আশা, ওরা একে অপরকে খতম করবে।"

ইরানের লক্ষ্যবস্তুগুলির স্যাটেলাইট ছবি ইরাককে দিয়েছিল আমেরিকাই। একই সময় আমেরিকা যে ইরানকেও বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছিল, সেটা ইরান-কনট্রা কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ায় প্রকাশ পেয়েছিল।

ইরাক-ইরান যুদ্ধের ফলাফল হয়েছিল বিধ্বংসী, যা ১০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল, দুটি দেশকেই দুর্বল করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও উপসাগরীয় যুদ্ধ

১৯৮৮ সালে ঐ যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী ইরাককে এক নতুন ও গভীর বিপদের মুখে ঠেলে দেয় যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইরাকের সামরিক ও মৈত্রী চুক্তি ছিল। পশ্চিমের সাথে "বৈরিতার স্থায়ী অবসান ঘটানোর" খোঁজে মস্কোর গরবাচভ নেতৃত্ব উন্নয়নশীল দুনিয়ায় মিত্র দেশগুলির প্রতি সাহায্য সমর্থন কমাতে শুরু করে।

১৯৮৯ সালে গরবাচভ আরও এগিয়ে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি সমর্থনও প্রত্যাহার করে নেন, যার পর তাদের অধিকাংশের পতন ঘটে যায়। আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের এই গুরুতর পরিবর্তনকে — যা দুবছর পর খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে চূড়ান্ত রূপ নেয় — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বোত্তম বিজয় বলা যায়।

এই ঘটনা ১৯৯২ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে নিষেধাজ্ঞা-অবরোধ ও বোমাবর্ষণ করে ইরাক ও তার জনগণকে ধ্বংস করার রাস্তা খুলে দেয়।

আজ আবার 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও মানবাধিকারের' বুলি আওড়ে ইরাকের বিরুদ্ধে বুশ প্রশাসন নতুন একটা যুদ্ধ চালাবার পক্ষে জনসমর্থন পেতে চাইছে। বাস্তব ঘটনা হল, ইরাকের সামরিক ক্ষমতা হ্রাস করা অথবা বিশ্বের কোথাও মানবাধিকার লংঘন নিয়ে আমেরিকা আদৌ চিন্তিত নয়।

২০০২ সালেও ইরাকের ক্ষেত্রে মার্কিন নীতি পরিচালিত হচ্ছে ৮০ বছর আগেকার সেই একই লক্ষ্য থেকে, তা হচ্ছে **তেল।**

যুদ্ধের প্রতিবাদে আমেরিকায় ইতিহাসবিদরা সোচ্চার

গত ৩ জানুয়ারি আমেরিকান হিস্টোরিকাল এ্যাসোসিয়েশনের ১১৭তম সভায় ৪০টির বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসিবিদেরা 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইতিহাসবিদ্‌গণ' নামে নূতন একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এই উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্রে বলা হয়েছে, 'আমরা ইতিহাসবিদেরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করার আহবান জানাচ্ছি। আমরা আমেরিকা সরকার কর্তৃক মানবজীবনের অকারণ ধ্বংসসাধন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক নিয়মকানুন রীতিনীতির গুরুত্বকে লঘু করা, নাগরিক স্বাধীনতাহরণ এবং স্বদেশে ও বিদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্বশান্তি বিঘ্ন ঘটানোর কারণে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।"

এই মুহূর্তে যুদ্ধের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য ইতিহাসবিদ্‌রা দেশজুড়ে 'Virtual Speakers Bureau' গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যাদের কাজ হবে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনকে সাহায্য করা। বুশ প্রশাসন যেভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের নানা বিকৃতি ঘটিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে তার যথাযথ প্রত্যুত্তর দেওয়া ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের প্রবাহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার কাজ করবে এই ব্যুরো।

উল্লেখ্য, এই সভায় আমেরিকার বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ উপস্থিত ছিলেন। এই সভা আহবান করেছিল দি র‍্যাডিক্যাল হিস্টোরিয়ানস্ অর্গানাইজেশন — মারহো (MARHO)। ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিরোধী প্রচার আন্দোলনের সমর্থনে এই সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

৪ জানুয়ারি, সভা চলাকালীনই আবেদনপত্রে ৪০০ জন ইতিহাসবিদ স্বাক্ষর দিয়েছেন। পরবর্তী দু'দিনের মধ্যে স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন। (ই মেল, ভ্যানগসে)

অস্ত্রবাহী ট্রেন চালাতে অস্বীকার করলেন ব্রিটেনের ট্রেন চালকরা

ইংল্যাণ্ডে অস্ত্রবাহী ট্রেন চালাতে অস্বীকার করেছেন ট্রেন ড্রাইভাররা। ব্রিটিশ সরকার যখন ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়বৃত্তি করছে, সেই সময় ইরাকে ব্যবহারের জন্য পাঠানো অস্ত্র বহন না করার এই সাহসী সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বিরোধী মানুষকে খুবই প্রেরণা দেবে।

গ্লাসগো এলাকা থেকে অস্ত্র নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে গ্লেন ডগলাস ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল ট্রেনটির। গ্লেন ডগলাস হল ইউরোপের মাটিতে ন্যাটোর বৃহত্তম অস্ত্র ঘাঁটি। ইংলিশ-ওয়েলস-স্কটিশ রেলওয়ের একটি ট্রেন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অর্ডার মাফিক অস্ত্র বোঝাই করেছিল। কিন্তু ড্রাইভাররা ট্রেন চালাতে অস্বীকার করে বলেছেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ইরাক আক্রমণ পরিকল্পনার তাঁরা বিরোধী।

রেল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করেও ড্রাইভারদের অস্ত্রবহনে রাজি করাতে পারেনি। ট্রেন যে চলেনি কর্তৃপক্ষ এখন তা অস্বীকার করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই নাকি ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে।

ড্রাইভারদের বুঝিয়ে রাজি করাতে রেল কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক করেও যে ব্যর্থ হয়েছে, সে কথাও তারা চেপে যেতে চাইছে। কর্তৃপক্ষ বলছে — এটা তাদের বাণিজ্যিক বিষয়, এ নিয়ে তারা আলোচনা করবে না। ইউনিয়নের সঙ্গে কি কথা হয়েছে তাও তারা বলবে না। একজন উচ্চপদস্থ রেলকর্তা অবশ্য গার্ডিয়ান পত্রিকাকে ঠিক উল্টো কথা বলেছেন এবং ট্রেনের নম্বরটিও দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রক এবং রেল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে সড়ক পথে অস্ত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্রিটিশ শ্রমিকদের এই যুদ্ধ বিরোধী ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ১৯২০ সালে সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যখন যৌথ সামরিক অভিযান চালিয়েছিল তখন লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া ডকের শ্রমিকরা রুশ রণাঙ্গণের উদ্দেশ্যে পাঠানো কামান জাহাজে তুলতে অস্বীকার করেছিল। ১৯৭৩ সালে চিলির বামপন্থী রাষ্ট্রপ্রধান সালভাদর আলেন্দেকে সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্ত করে হত্যা করার পর ব্রিটিশ বন্দর শ্রমিকরা চিলিতে অস্ত্র পাঠানো রুখতে ধর্মঘট করেছিল।

অস্ত্র বহন করতে অস্বীকার করার ব্যাপারে শ্রমিকদের সমর্থন করায় ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ও জরিমানা করা হতে পারে। ব্রিটেন জুড়ে যুদ্ধ বিরোধী বড় বড় বিক্ষোভ মিছিল এখন হচ্ছে। রেল শ্রমিকদের এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত মানুষকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেছে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে বিরাট যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি চলছে। উদ্যোক্তাদের দাবি — এই মিছিলে যোগ দেবে চার লাখেরও বেশি মানুষ। (তথ্যসূত্র ঃ কেভিন ম্যাগরের প্রবন্ধ, গার্ডিয়ান ৯.১.২০০৩, ই-মেইলে প্রাপ্ত)

আর এস পি কর্মীদের নির্মম হত্যার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন —

"কুমিরমারীতে সি পি আই(এম) কর্তৃক আর. এস. পি কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই হত্যাকাণ্ড পুনরায় প্রমাণ করছে এ রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করার জন্য সি পি আই(এম) শুধু বিরোধীদেরই নয়, নিজেদের ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত শরিক দলের উপরও কীভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে।

আমরা খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।"

দুই সরকারই শিক্ষার উপর আঘাত হানছে

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন —

"কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের সি পি এম সরকার উভয়েই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালকের পদে শিক্ষাগত যোগ্যতার মানের বিচার নয়, স্রেফ দলীয় আনুগত্যের মাপকাঠিতে লোক বসাচ্ছে। ফলে শিক্ষায় সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ যতটুকু ছিল তাও অবলুপ্ত হচ্ছে। ফলে এই প্রশ্নে একের অপরের বিরুদ্ধে বলার কোন নৈতিক অধিকার নেই। কেন্দ্র-রাজ্য সরকার উভয়ে একমত হয়ে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে, অত্যধিক ব্যয় বাড়িয়ে মধ্যবিত্ত ও গরিবদের সামনে শিক্ষার সুযোগ রুদ্ধ করছে, যুক্তিবিরোধী যান্ত্রিক মন তৈরির জন্য সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সঙ্কুচিত করে কারিগরি শিক্ষায় প্রাধান্য দিচ্ছে। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার হিটলারের পথে শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্ধতা ও উগ্র ঐতিহ্যবাদকে জাগিয়ে তুলছে। আমরা উভয় সরকারের এই জনস্বার্থবিরোধী শিক্ষানীতি ও পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহারের দাবি করছি।"

পুরুলিয়া জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ডাকে সভা, সমাবেশ

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বকলমে গরিব, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম প্রায় তিনগুণ বাড়িয়ে বৃহৎ শিল্পপতিদের দাম কমিয়ে দেবার রাজ্য সরকারের চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং স্বৈরাচারী ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০১ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী) প্রত্যাহারের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ডাকে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুরাডি ঃ গত ১৯ নভেম্বর জেলা সম্মেলনের পর গত ২৪ ডিসেম্বর রামচন্দ্রপুর মুরাডি আঞ্চলিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মুরাডি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন কৃষ্ণপুর হাটতলায়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল মাইতি। সম্মেলনে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তুলতে অমিত চ্যাটার্জীকে সম্পাদক এবং মানিক চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করে ২৫ জনের রামচন্দ্রপুর মুরাডি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

রঘুনাথপুর ঃ গত ৩ জানুয়ারি রঘুনাথপুর বাসস্ট্যাণ্ড এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সমিতির রঘুনাথপুর থানা কমিটির সহসভাপতি মনোহর শর্মা। সভায় বক্তব্য রাখেন লিগ্যাল এড সার্ভিস'-এর পক্ষ থেকে এ্যাডভোকেট দেবব্রত সরকার, সমিতির পুরুলিয়া জেলা কমিটির সহ সভাপতি শৈলেন বাউরী, গ্রাহক সমিতির রাজ্য নেতা অমল মাইতি, জেলা কমিটির সম্পাদক লক্ষ্মী নারায়ণ সিন্‌হা। ২০ জানুয়ারি কলকাতায় আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হওয়া, সমিতি আহূত ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করা ও প্রয়োজনে আগামী দিনে সারা রাজ্যে বিদ্যুৎ বিল বয়কট করার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে গ্রাহকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য সকল বক্তাই আহবান জানান।

ঐ দিন সভায় রঘুনাথপুর শহরের ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন।

মধুকুণ্ডা ঃ গত ৪ জানুয়ারি মধুকুণ্ডা রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন হাটতলায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বালিতোড়া আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বদ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষক সুভাষ মাজী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আসানসোল বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সম্পাদক সঞ্জয় চ্যাটার্জী। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন অমল মাইতি।

ষষ্ঠ সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

দুয়ের পাতার পর

ছাত্র-যুব সাধারণ মানুষকে এই সমূহ বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্যই নয়, একে প্রতিহত করার উপযুক্ত দেশব্যাপী শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

আজ যখন পুঁজিবাদ জরাগ্রস্ত অধঃপতিত, সমস্যা জর্জরিত এবং যখন আরও উন্নততর সমাজের পত্তনের জন্য তার জমি ছেড়ে দেওয়ার কথা, শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী তখন এই ঐতিহাসিক সত্যকে ভয় পাচ্ছে। এই বিশ্বপ্রকৃতিকে যে বাস্তব নিয়মগুলো নিয়ন্ত্রিত করে, সেইসব নিয়মকে খুঁজে বের করে সত্যকে আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের কাজ। সেই কারণে স্বভাবতঃই বুর্জোয়াশ্রেণী আজ বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারকে ভয় পায়। কারণ যদি কোটি কোটি শোষিত মানুষ এই বাস্তব সত্যের খোঁজ পায়, তবে হাজার মিলিটারি শক্তি দিয়েও শাসক বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশকে রুখতে পারবে না। আধুনিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হচ্ছে তারা প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞানকে চায় কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাকে ভয় করে। এ যুগের অগ্রণী মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ — যাঁর চিন্তা ও শিক্ষাকে পাথেয় করে আপনাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে — তিনি অনেক আগেই দেখিয়েছিলেন যে ফ্যাসিবাদ হলো বিজ্ঞানের কারিগরী দিকের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। আমাদের দেশে বহু আগেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে — সেই কংগ্রেস আমল থেকে। এখন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বিজেপি সরকার এই প্রক্রিয়াকে এতদূর ত্বরান্বিত করেছে যে জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদিকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচার করে যে বিজ্ঞান জীবনে পথ দেখাতে পারেনা। সে পথ দেখাতে পারে কেবলমাত্র অধ্যাত্মবাদ। অথচ বাস্তব হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞানই সমাজ ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিয়মগুলোকে আবিষ্কার করে মানুষকে জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বাস্তব রাস্তা দেখায়। আর জ্যোতিষবিদ্যা মানুষকে অদৃষ্টবাদ ও অসহায়তার হাতে আত্মসমর্পণ করতে শেখায়।

কমরেড চক্রবর্তী দেখান যে, বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে খতম করার দুরভিসন্ধি ছাড়াও সংঘ পরিবার সংবেদনশীল মন, সূক্ষ্ম আবেগ ধ্বংস করার জন্য গুজরাটের মত ফ্যাসিস্ট কায়দায় হত্যালীলা চালাচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটি অমূল্য শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কমরেড চক্রবর্তী বলেন যে, সমাজ-বিকাশের প্রতি স্তরে, প্রতিটি দেশে সবসময়ই গুটিকয়েক মানুষ, তরতাজা মেধাবী যুব-ছাত্ররা এগিয়ে এসে সর্বসাধারণকে সংগঠিত করেছে এবং উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়ে বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। তিনি গভীর প্রত্যয়ে বলেন যে, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে সারা ভারত ডি এস ও এই ছাত্র আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করবে।

বিপুল হর্ষধ্বনি ও স্লোগানের সঙ্গে প্রকাশ্য অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৪ সংখ্যা ৮

জার্মানি

◆ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরে ৫ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশ

১৮ জানুয়ারি, ২০০৩ ঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের ধিক্কার

◆ সানফ্রানসিসকোতে ২ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ

হংকং

লাহোর

টোকিও

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net